স্বাধীনতার সনদ

তোফায়েল আহমেদ

১৯৭১-এর ঐতিহাসিক সাতই মার্চ, এই দিনটির জন্যই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনভর সংগ্রাম করেছেন। দীর্ঘ ১৩টি বছর কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কাটিয়েছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই তিনি লক্ষ্য নির্ধারণ করেন 'একদিন বাংলার ভাগ্যনিয়ন্তা বাঙালীদেরই হতে হবে।' সেই পথেই তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছেন। মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। জাতির মুক্তি সনদ ছয় দফা দাবীর মাধ্যমে বাংলার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন। 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য' তথা আগরতলা মামলার আসামী হিসেবে ফাঁসিকাষ্ঠে গিয়েছেন। কিন্তু বাঙালীর জাতীয় মুক্তির প্রশ্নে আপোষ করেননি; বরং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। '৬৯-এর প্রবল গণআন্দোলন-গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁকে কারামুক্ত করি।

জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখবো, একেকটা ঘটনার সাথে একেকটা ঘটনা সম্পর্কিত। বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন একটি লক্ষ্য নিয়ে। ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের অগ্রগামী বাহিনী। জাতীয় নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু যা বলতে পারতেন না, ছাত্রলীগ দিয়ে সেটা বলাতেন। আজকাল অনেকে অনেক কথা বলেন, অনেক কিছু লেখেন-কে তুলেছে 'স্বাধীন বাংলার পতাকা', কে বলেছে 'জাতীয় সঙ্গীত' ইত্যাদি। ইতিহাসের সত্য হচ্ছে, এগুলো বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নির্ধারিত। বঙ্গবন্ধুর অনুমোদন ছাড়া কোন কিছু হয়নি। '৬৬-এর মার্চে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা...'-পরবর্তীতে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত-এই গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের শেষ দিন পল্টন ময়দানে জনসভার শুরুতে এই গান পরিবেশনের পর বঙ্গবন্ধু বক্তৃতায় বলেছিলেন, 'ছয় দফা বাংলার মানুষের মুক্তি সনদ'। তারপর '৭০-এর ঐতিহাসিক নির্বাচন। একটি কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলতে চাই-'৭০-এর নির্বাচনে যদি বঙ্গবন্ধু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেতেন, তাহলে কি আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেতাম? হয়তো পেতাম, কিন্তু অনেক সময় লাগতো। নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধু '৭০-এর নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। '৭০-এর ৩০ মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২ অনুযায়ী লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার বা সংক্ষেপে এলএফও জারী হয়। সর্বমোট ৪৮টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এই এলএফও-তে-৬ ও ১১ দফার দুটি দফা-এক. 'প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার' এবং দুই. 'জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব' মেনে নেওয়া হয়। ফলত, জাতীয় পরিষদে ৩১৩টি আসনের মধ্যে জনসংখ্যার অনুপাতে আমরা পাই ১৬৯টি আসন। কিন্তু ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও যাতে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে না পারেন সেজন্য ইয়াহিয়া খান এলএফও-তে বিতর্কিত ২৫ ও ২৭ নং দু'টি অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত করেন। ২৫ নং অনুচ্ছেদের শিরোনাম ছিল, 'শাসনতন্ত্রের প্রমাণীকরণ'। যাতে বলা হয়েছিল, 'জাতীয় পরিষদে গৃহীত শাসনতন্ত্র বিল, প্রমাণীকরণের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপিত হবে। এ পর্বে প্রমাণীকরণে প্রত্যাখ্যাত হলে জাতীয় পরিষদের অবস্থান লুপ্ত হবে।' আর ২৭ নং অনুচ্ছেদের শিরোনাম ছিল, 'আদেশের সংশোধন এবং ব্যাখ্যা, ইত্যাদি'; এর ক-ধারায় ছিল, 'এই আদেশের কোন আইনের ধারা সম্পর্কে কোন ধারণা, কোন ব্যাখ্যা বা কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং এ ব্যাপারে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।' একই অনুচ্ছেদের খ-ধারায় ছিল, 'জাতীয় পরিষদ নয় বরং রাষ্ট্রপতিই এই আদেশের সংশোধনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী।' এলএফও-তে সন্নিবেশিত দু'টি ধারাই ছিল আসন্ন নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ঠেকানোর অপপ্রয়াস। যার জন্য অনেকেই বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, 'এই নির্বাচন করে কোন লাভ নেই।' বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার এই নির্বাচন ক্ষমতায় যাওয়ার নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন হলো গণভোট এবং নির্বাচনের পরপরই আমি এই এলএফও টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো।' '৭০-এর ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও ১৭ ডিসেম্বর ছিল প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন। ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের নির্বাচন ৭ ডিসেম্বর না হয়ে '৭১-এর ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়। ফলে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে থেকে সারা বাংলাদেশ সফরের সুযোগ পাই। আমরা সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদে ১৬৯টি আসনের ১৬৭টি আর প্রাদেশিক পরিষদে ২৯৮টি আসনে জয়লাভ করি। বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে '৭১-এর ৩ জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শপথ অনুষ্ঠান। সেদিনের শপথসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, '৬ দফা আজ আমার না, আমার দলেরও না। এই নির্বাচনের মাধ্যমে ৬ দফা জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ যদি এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে এবং আমি যদি করি আমাকেও।' এই শপথ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৬ দফাকে তিনি আপোষহীন অবস্থায় উন্নীত করেন। এরপর অনেক ঘটনা ঘটেছে। ভুট্টো-ইয়াহিয়া ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। '৭১-এর ১ মার্চ ৬ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের জন্য হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠক চলাকালে পূর্বাহ্নে ডাকা ৩ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে একতরফাভাবে স্থগিত ঘোষণা করেন। তৎক্ষণাৎ দাবানলের মতো আগুন জ্বলে উঠে। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমরা পল্টন ময়দানে যাই। সেখানে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করি। বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগ ও ডাকসু'র সমন্বয়ে স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেন। ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে তাঁকে 'জাতির পিতা' আখ্যায়িত করে 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করা হয়।

এরপর আসে ঐতিহাসিক সাতই মার্চ। সাতই মার্চ এক দিনে আসেনি। ধাপে ধাপে এসেছে। এই সাতই মার্চের ভাষণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি বিচক্ষণ নেতা ছিলেন। সবসময় সতর্ক ছিলেন যাতে তিনি আক্রমণকারী না হয়ে আক্রান্ত হন। আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাহায্য-সহযোগিতা ও স্বীকৃতি পাবার জন্য তিনি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে কেউ যেন বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত করতে না পারে সে জন্য তিনি সতর্কতার সাথে বক্তৃতা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এখানে শ্রদ্ধাভরে বঙ্গমাতাকে মনে পড়ে। ৬ মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু বারান্দায় পায়চারী করে আগামীকালের বক্তৃতা নিয়ে ভাবছিলেন। শ্রদ্ধেয়া বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রেরণা দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমার

ভাববার কি আছে। সারাজীবন তুমি একটা লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতি করেছ। জেল-জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেছ। বারবার ফাঁসির মঞ্চে গিয়েছ। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছ। বিশ^াসী আত্মা থেকে তুমি যা বিশ^াস করো, তাই বলবা।' ঠিকই বঙ্গবন্ধু বিশ^াসী অন্তর থেকে সাতই মার্চের বক্তৃতা করেছিলেন। এটি দুনিয়া কাঁপানো বক্তৃতা। পৃথিবীর কোন ভাষণ এতোবার উচ্চারিত হয়নি। একটি অলিখিত বক্তৃতা তিনি দিলেন বিশ^াসী অন্তর থেকে। যা তিনি বিশ^াস করতেন তা-ই বলতেন। শত্রুপক্ষ গোলা-বারুদ, মেশিনগান, কামান, হেলিকপ্টার-গানশিপ, ট্যাঙ্কসহ সবকিছু নিয়ে প্রস্তুত। সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর। অনেকেই তো বঙ্গবন্ধুকে বলতে চেয়েছেন, আজকেই যেন বলেন, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।' কিন্তু বঙ্গবন্ধু কারো দ্বারা প্ররোচিত হননি। সাতই মার্চ সকাল থেকেই রেসকোর্স ময়দানে জন¯্রাতে আসতে থাকে। মানুষের মুখে মুখে তখন 'স্বাধীনতা'। একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে। সাতই মার্চ দুপুরে আমি এবং আমারই আরেক নেতা-নামোল্লেখ করলাম না-আমরা দু'জন বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু আমাদের দু'জনের কাঁধে হাত রেখে কথা বলছিলেন। আমাদের সেই নেতা যখন বঙ্গবন্ধুকে বললেন,-তিনি তাঁকে 'লিডার' বলে সম্বোধন করতেন-'লিডার, আজকে কিন্তু পরিপূর্ণ স্বাধীনতার ঘোষণা ছাড়া মানুষ মানবে না।' আমাদের কাঁধে রাখা হাত নামিয়ে তাঁর নামোচ্চারণ করে বঙ্গবন্ধু ইংরেজিতে বললেন, 'আই অ্যাম দি লিডার অব দি পিপল। আই উইল লিড দেম। দে উইল নট লিড মি। গো অ্যান্ড ডু ইউর ডিউটি।' এই বলে তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উপরে চলে গেলেন।

আমরা ধানমন্ডি থেকে রওয়ানা করি পৌনে তিনটায়। রেসকোর্স ময়দানে পৌঁছাই সোয়া তিনটায়। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা আরম্ভ করেন সাড়ে তিনটায়। দশ লক্ষাধিক জনতার গগনবিদারী স্লোগানে মুখরিত রেসকোর্স ময়দান। সেদিনের সভামঞ্চে জাতীয় চার নেতা-সর্বজনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানসহ-আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, চারদিকে তাকালেন। মাউথপিসের সামনে পোডিয়ামের উপর চশমাটি রাখলেন। হৃদয়ের গভীরতা থেকে-যা তিনি বিশ্বাস করতেন, যার জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন, ফাঁসির মঞ্চে গিয়েছেন, সেই বিশ্বাসী আত্মা দিয়ে, বাংলার মানুষকে ডাক দিলেন, 'ভাইয়েরা আমার'। তারপর একটানা ১৯ মিনিট ধরে বলে গেলেন দুনিয়া কাঁপানো মহাকাব্য। বক্তৃতায় তিনি মূলত স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। বঙ্গবন্ধুর সামনে ছিল দুটি পথ। এক. স্বাধীনতা ঘোষণা করা। দুই. পাকিস্তান ভাঙার দায়িত্ব না নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত না হয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য প্রদান করা। তিনি দুটোই করলেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন সেদিনের পরিস্থিতি। যেটা তিনি আমাদের বলেছিলেন। সেনাবাহিনী তখন প্রস্তুত। মাথার উপর বোমারু বিমান এবং হেলিকপ্টার গানশিপ টহল দিচ্ছে। যখনই বঙ্গবন্ধু এই ভাষায় বলবেন যে, 'আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন', তখনই তারা গোলাবর্ষণ শুরু করবে। সেজন্য বঙ্গবন্ধু সবকিছু জেনেই বক্তৃতা করেছেন। এতো বিচক্ষণ নেতা ছিলেন যে, সমস্ত ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে সামরিক শাসকের উদ্দেশে চারটি শর্ত আরোপ করলেন-মার্শাল 'ল প্রত্যাহার কর, সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নাও, এ কয়দিনে যে হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে তার বিচারবিভাগীয় তদন্ত কর এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কর। এই চারটি শর্ত আরোপ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত হলেন না। পাকিস্তানীরা তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন সদাসতর্ক এবং সচেতন। অপরদিকে পুরো বক্তৃতাটি জুড়ে ছিল আসন্ন জনযুদ্ধের রণকৌশল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই।' 'আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেব্রা চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।' 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছু, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।' 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে' তোলার আহব্বান জানিয়ে বললেন, 'সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না।' নির্দেশ দিলেন 'আটাশ তারিখে কর্মচারীরা যেয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।' সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশে বললেন, 'আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো কেউ দেবে না।' গরীবের কথা খেয়াল রেখে বলেছেন, 'গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে' সে জন্য শিল্প কল-কারখানার মালিকদের উদ্দেশে বলেছেন, 'এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছেন প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছায়া দিবেন।' জীবনভর লালিত প্রগাঢ় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে বিরোধী রাজনীতিকদের উদ্দেশে বলেছেন, 'যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।' আর রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেছেন, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাক। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।' বক্তৃতার শেষে বজ্রকণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বলেছেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতা সংগ্রাম।' অর্থাৎ সামগ্রিকতায় জাতীয় মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার ভারসাম্যপূর্ণ বক্তৃতা। সেদিনের সেই স্মৃতি মানসপটে ভেসে ওঠে। অভূতপূর্ব দৃশ্য, কল্পনা করা যায় না। এটিই মানুষ প্রত্যাশা করেছিল। একটা কথা আমার বারবার মনে হয়। একজন নেতা কতো দূরদর্শী যে, তিনি সবসময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে জানতেন। কোন্ সময় কোন্ কথা বলতে হবে এটা তার মতো ভালো জানতেন এমন মানুষ আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে দেখিনি। আমি লক্ষ্য করেছি, বঙ্গবন্ধু জীবনে কখনো স্ববিরোধী বক্তব্য দেননি। একটি বক্তব্য দিয়ে পরে সেই বক্তব্য অস্বীকার করা বা বক্তব্যের মধ্যে পরস্পরবিরোধীতা এটি তাঁর কোনদিন হয়নি। কারণ, যা তিনি বিশ্বাস করেছেন, ভেবেছেন, মনে করেছেন যে এটিই বাস্তবসম্মত, সেটিই তিনি বলেছেন সুচিন্তিতভাবে। আর যা একবার বলেছেন, মৃত্যুর কাছে গিয়েও আপোষহীনভাবে সেই কথা তিনি বাস্তবায়ন করেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর হৃদয়ে ধারিত গভীর বিশ্বাস থেকেই সেদিন বক্তৃতা করেছেন।

আমরা যদি বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের বক্তৃতা বিশ্লেষণ করি তবে দেখবো, অলিখিত একটি বক্তৃতা। ভাষণের সময় ১৯ মিনিট। শব্দ সংখ্যা ১৬০৮টি। আব্রাহাম লিংকনের এবঃঃুংনঁৎম অফফৎবংং-এর শব্দ সংখ্যা ২৭২, সময় ৩ মিনিটের কম এবং লিখিত। অপরদিকে, মার্টিন লুথার

কিং-এর ‘ও যধাব ধ ফৎবধস’ ভাষণটির সময় ১৭ মিনিট, শব্দ সংখ্যা ১৬৬৭। কিন্তু বিশ্বের কোন নেতার ভাষণ এমন সংগ্রামমুখর ১০ লক্ষাধিক মুক্তিকামী নিরস্ত্র মানুষের সামনে হয়নি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণটি প্রদান করে মানুষকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে, নিরস্ত্র বাঙালীকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করে মুক্তিযুদ্ধের দিকনির্দেশনা দিলেন। কি বিচক্ষণ একজন নেতা! আইএসআই সাতই মার্চ ঢাকা ক্লাবের সামনে ছিল। তারা অপেক্ষা করেছিল-যে ঘোষণাটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মধ্য দিয়ে বলেছিলেন, ‘আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন’-তারা মনে করেছিল সেই কথাটি তিনি সাতই মার্চ বলবেন। আমি আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধু ছিলেন সতর্ক। তিনি সবই বলেছেন, কিন্তু শত্রুর ফাঁদে পা দেননি। উল্টো শত্রুকেই ফাঁদে ফেলেছেন। যার জন্য পরদিন আইএসআই রিপোর্ট করলো ‘চতুর শেখ মুজিব চতুরতার সাথে বক্তৃতা করে গেল। একদিকে স্বাধীনতা ঘোষণা করলো, আরেকদিকে ৪টি শর্ত আরোপ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যায় আখ্যায়িত হলো না এবং পাকিস্তান ভাঙার দায়িত্ব নিল না। আমাদের নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। আমরা যে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলাম সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো।’ এই ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। একটি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছেন। একটি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তিনি নিরস্ত্র বাঙালীকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছেন। এই বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিচ্ছিন্নতাবাদের দায় এড়িয়ে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে একই মোহনায় দাঁড় করিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন।

সাতই মার্চের দুনিয়া কাঁপানো বক্তৃতা ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের চলার পথের দিকনির্দেশনা-যা আমরা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছি। আজ ঐতিহাসিক এই ভাষণ জাতীয় সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক দিগন্তে বাঙালীর গৌরবময় পতাকা মর্যাদার সঙ্গে উড্ডীন রেখেছে। ২০১৭-এর ৩০ অক্টোবর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো ’৭১-এর সাতই মার্চে প্রদত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যেও (ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ) অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। যা সমগ্র জাতির জন্য গৌরবের এবং আনন্দের। দুটি মহান লক্ষ্য সামনে নিয়ে বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করেছেন। এক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা। দুই. অর্থনৈতিক মুক্তি। প্রথম লক্ষ্য পূরণ করে যখন তিনি দ্বিতীয় লক্ষ্য পূরণের দ্বারপ্রান্তে ঠিক তখনই ’৭৫-এর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। জাতির জনকের দুই কন্যা তখন বিদেশে অবস্থান করায় রক্ষা পান। ’৮১-এর ১৭ মে জাতির জনকের জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার হাতে আওয়ামী লীগের রক্তে ভেজা পতাকা আমরা তুলে দেই। সেই সংগ্রামী পতাকা হাতে নিয়ে নিষ্ঠা ও সততার সাথে চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করে আজ বাংলাদেশকে তিনি উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন। দেশের ৮০% জনসাধারণকে বিনা মূল্যে টিকা প্রদান করে করোনা মহামারীর কবল থেকে দেশকে রক্ষা করেছেন। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ হবে জাতির জনকের স্বপ্নের সোনার বাংলা।

#

লেখক ঃ আওয়ামী লীগ নেতা; সংসদ সদস্য; সভাপতি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।

১৩.০৩.২০২২ পিআইডি ফিচার